অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

বড়োই বিপাকে পড়েছি হে। ঘিলুতে লোকটার এই একটা কথাই পাক খাচ্ছে। তাও মনে মনে। কী বিপাক, কীসের বিপাক কেউ জানে না। মাসখানেক ধরে এই একটা কথাই পাক খায়। ছনের চালে কাক এসে বসে থাকে হুস করলে উড়ে যায়, কিন্তু এই বিপাক উড়ে যায় না। আবাদে আখাম্বা ষাঁড় দৌড়ায়, হাতে লাঠি নিয়ে তাড়া করলে, সেও দৌড়ায়। পাখ পাখালি গমের জমিতে উড়ে এলে হাঁ হাঁ করে তেড়ে যায়, পোকামাকড়ের বড়ো উপদ্রব। তার এক কথা। বিষম বিপাকে পড়েছি হে।

এই বিপাক মাসখানেক দৌড় করাচ্ছে তাকে। তা তুই আবাগির বেটি বুঝলি না, তোর বাপ মুখ দেখায় কী করে! শিরে বজ্জাঘাত। এখন আমি তাকে পাই কোথা!

হা শুনছ বাবা!

কে?

আমি তোমার খুড়ামশায়।

কিছু করেন।

আরে দেবীর খোঁজ জান!

ও তো নলহাটির কাছে কোথায় থাকে?

তারে যে একখান খবর পাঠাতে হয়।

তারপরই চুপ, খবর কেন! কীসের খবর!

মাখন কুণ্ডু দেবী ঠাকুরের খবর জানতে চায় কেন! খবর পাঠাতে চায় কেন!

পাড়া প্রতিবেশীরা কেমন চুপ মেরে গেছে। সৃষ্টিছাড়া কাজ হয়ে গেল যে, উঠোনের মাঝখানে অপকর্ম্মটা সেরে গেল। ধূপ ধুনোর তো খামতি নেই। সকাল থেকে তার কাজ, জমিতে যে দিনে যা লাগে সবকিছুর জন্য ছোটাছুটি। গোরুর দুধ ঘরে—তা অভাব অনটন আছে, ছানি মানি ধানি তিন কন্যে, বড়ো পুত্র কাঁচরাপাড়ায় কলে কাজ করে, হপ্তার ছুটিতে এলে যেতে চায় নালাগোয়া ঘরটায়। উঠতি যুবকেরা তখন ভিড় বাড়ায়—কীসের গরমে সে বোঝে। শরীরে গরম ধরলে এটা হয়।

মানুষটা সব বুঝেও চুপচাপ ছিল। ছানি মানি ধানি তিনজনাই সোমত্ত, গায়ে গরম ধরে গেছে। পুরুষ মানুষ বড়ো সংক্রামক ব্যাধি, এলেই গায়ে তাপ বাড়ে। তা বাড়ছিল, বেশ কথা। বাড়তে বাড়তে আগুন লেগে যাবে, মুখপুড়ী রাক্ষুসী তোর এ কথাটা মনে এল না। পেটের মধ্যে, আগুন গিলে বসে আছিস, কে নেভায়।

সহসা তার আর্তনাদ, কার কাম ক দিকি, মুণ্ডু ছিঁড়ে আনি!

ছানি মুখ থুবড়ে বসে পড়েছিল সেদিন। বমি, গা গোলায়, তা তুই কুমারী মেয়ে, আমিতো বসে নেই-বয়স হলে গোরু বাছুরের মতো পাল খাওয়াতে হয়, মনুষ্য সমাজে বাস, শাঁখা, সিঁদুর লাগে, আর লাগে হলুদ বাটা, আম্র পল্লব—সামিয়ানা টানাতে হয়, তার নীচে আগুনের কুণ্ডু, হোম দু-হাতের মিলন, তারপর যদৃচ্ছ আচরণ, যেমন খুশি পা তুলে নামিয়ে, উপুড় করে কিংবা উটের মতো মুখটি তুলে হাঁটো, কিছু বলার নেই—মাথা উঁচু করে হাঁটতে কষ্ট হয় না। পেটে আগুন থাকলেও জ্বলে না।

কার কাম? বল! বল পোড়াকপালী সর্বনাশী, দা খানা কোথায়, না বলিস তো দা দিয়ে গলাখানা কেটে ফেলব।

ছানি কী বলবে। ডাগর চোখে তাকিয়ে আছে। ধানি মানি বাবাকে জড়িয়ে ধরেছে।–ও বাবা কী কচ্ছ, ও বাবা তুমি কি পাগল হয়ে গেলে? বাবা বাবা!

মাখন কুণ্ডু তেড়ে যাচ্ছে আর বলছে, তার আগে আমি কেন গলায় দড়ি দিলাম না। তোদের মা থাকলে সে সব সামলাত! আমি কার কাছে যাই, কী করি! আবার হুংকার, বলবি না, কে করল। কোন পাষণ্ডের কাজ। আমার এমন সুন্দর কন্যেটাকে নষ্ট করে দিল।

ছানি ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়েছিল। কিছু বলে না! খাচ্ছে না! দুপুরে দরজা বন্ধ করতেই গোলমাল, ও বাবা শিগগির, এস। ক্ষোভে দুঃখে মাখন নিজের জমির আলে মুখ গামছায় ঢেকে শুয়েছিল। খায়নি স্নান করেনি, কোনোদিকে বের হয়ে যাবে ভাবছিল—তুই হলিগে ধরিত্রী। আবাদের সময় পার হয়ে যাচ্ছে বুঝি। তা পাত্রপক্ষের এত জুলুম আমি অভাবী মানুষ সামলাই কী করে!

কী হল!

শিগগির এস। দিদি দরজা বন্ধ করে দিচ্ছে।

আতঙ্ক। সে মাথার গামছাখান হাতে নিয়ে ছুটেছিল। সুখো মিঞা রাস্তায়। গোরুর গাড়ি নিয়ে শহরে যাচ্ছে-তার সামনে পড়ে গিয়ে মানি ধানি জমির মধ্যে নেবে গেল।-বড়োভাই ছুইট্টে গ্যাল! কী ব্যাপার!

ধানি শাড়ির আঁচলে গা ঢাকছিল। বাবা দৌড়াচ্ছে। কথা কবার সময় নাই। ছুটতে ছুটতেই বলল, শকুন উড়তাছে সুখা ভাই।

কোনখানে?

বাড়ির মাথায়।

আসলে এই শকুনের ওড়াউড়ি তারা বড়ো হতে না হতেই টের পায়। চোখ দেখলে টের পায়। দিদি এখন পেটে আগুনের আঙরা নিয়ে বসে আছে, পেটে আগুনের আঙরা এবং এসব মনে হলেই ধানি মানির মনে হয়, সব শকুন। সব ক-টা শকুন। দেবীদা, অমর, গোপাল ছান সব। ওরা কী টের পেয়ে গেল। দাদাটাও মাসখানেক বাড়ি আসছে না। কী যে করে। শাড়ির আঁচল সামলে তালগাছটার নীচে আসতেই কেমন আতঙ্ক-পা অসাড়। তবু টেনে টেনে যখন উঠোনে হাজির, দেখল দিদি আবার অক অক করে বমি করছে।

ধানির মনে হল, বমি পেয়েছে বলে রক্ষা, দরজা খুলে বমি করতে বের হয়েছে। না হলে সর্বনাশ।

মানি ফুঁপিয়ে কাঁদল দিদিকে জড়িয়ে। আর ঠেলাঠেলি, তুই কেন দিদি দরজা বন্ধ করে দিচ্ছিলি,—এই দিদিরে, তুই কেন, কেন! দরজা বন্ধ করলে মাথাকুটে মরব বলে দিচ্ছি। বাবাতো একরামের নানির কাছে যাবে। সব সাফ হয়ে যাবে দেখবি! ভালো হয়ে যাবি।

আসলে এতটা কথা মানি বলতে জানে না। টের পেয়ে সেও গুম মেরে গেছিল। ধানির ফিসফিস কথাবার্তা—দেবীদা ছাড়া কেউ না। আসুক ঠ্যাং খোঁড়া করে দেব।

তা হতেই পারে। মিলে যাত্রা দেখতে গেলে, দিদি একা বাড়ি ছিল। পূজার দিনে শহরে ঠাকুর দেখতে গেলে দিদি একা বাড়ি ছিল। ফাঁক ফোঁকরে ইঁদুর বাদুড় ঘরে ঢুকে গেছে। দিদি কিছু বলছে না, বাবা গুম মেরে গেছে—মাঝেমাঝে একখানই কথা, বিষম বিপাকে পড়েছি হে।

তা সংসারে কন্যের বাপ হওয়াটা বড়ো দায় হে। এই একখান কথাও ত্রিভুবনে লংকা কাণ্ড-কন্যের জমিতে বীজ ফেলে তুই উধাও হলি। হারামির বাচ্চা। দেখি নাগাল পাই কী না।

গোপনে গোপনে সাফ করার চেষ্টা, এক সকালে মাখন দুটো শেকড় এনে দিল ধানিকে। বলল, পাঁচ ক্রোশ হেঁটে গেছি হেঁটে এসেছি। নির্ঘাৎ পাতের কথা বলে দিয়েছে।

ধানি বলল, শুধু বেটে খাওয়ালেই হবে।

সঙ্গে নিরসিন্দার পাতার রস।

আর কী।

আর ত কিছু বলেনি।

সব গোপনে গোপনে, বাড়িগুলি ফাঁকা ফাঁকা বলে রক্ষা, প্রথম থেকেই গোপন রাখা গেছিল, কিন্তু শেষে আর পারা যায়নি।

এই দিদি রসটা খেয়ে নে।

ছানি পাশ ফিরে দেখছিল ধানিকে। হাতে কাচের গেলাস নীল রঙের রস। ছানির চোখ সাদা ধূসর, মুখ শুকনো, গলা টিপে আত্মহত্যার চেষ্টা করার সময় মনে হয়েছে, পেটে তার আবাদ, সে মরে গেলে আবাদ নষ্ট। পারেনি।

এই দিদি ওঠ না।

ছানি শাড়ির আঁচলে মুখ ঢেকে রেখেছে।

দিদি।

বাইরে বসে আছে মাখন কুণ্ডু।–নচ্ছার, কুলটা মেয়ে, বংশের মুখে কালি দিলি! তুই মরে যা। মরে যা। সবই মনে মনে—ত্রিসংসারে তার আর কে আছে? এই তিনটে কন্যে, কিছু

হাঁস কবুতর, গোয়াল গোরু বাছুর, জমিজমা–চাষা মানুষের যা হয় লেপ্টে থাকার স্বভাব, এই তিন কন্যে নিয়ে সে লেপ্টে ছিল।—ছানিরে তুই একী সর্বনাশ করলি রে!

দিদি ওঠ। খা। বাবা চিল্লোচ্ছে।

সহসা ছানি উঠে বসল, গ্লাসটা কেড়ে নিল ধানির হাত থেকে। তরপর উঠোনে ছুঁড়ে মারল। শেষে আবার গিয়ে শুয়ে পড়ল। মাখন কুণ্ডু ভাবল, উঠে গিয়ে মেয়ের চুল ধরে টেনে আনে। আছড়ে-পিছড়ে পেট থেকে পিছলে বের করে আনে এক কুলাঙ্গার ইতরটাকে। হাতের কাছে না পেয়ে দাঁত নিশপিশ করছে। যেন বেটা ভূত হয়ে উবে গেল। তারপরই মনে মনে এক কথা, বিষম বিপাকে পড়েছি হে!

মাথায় চড়াৎ করে দেবী ঠাকুর এ-ভাবে হেগে দিয়ে যাবে কল্পনাও করতে পারেনি। বামুনের বেটা তুই, আমার কন্যের এত বড়ো সর্বনাশ করলি! তা পঞ্চায়েতে গেলে হয়।

কে বলল পাশ থেকে, তুই পাগল মাখন!

আপনি কে গুরুঠাকুর?

আমি কে দেখতে পাও না!

অ আপনি আমার মাথার ঘিলু। তা বলেন, কী করব। খুঁ

জে দেখ পাও কি না।

মাখন খুঁজে দেখতে বের হয়ে গেল। সেই যে বের হয়ে গেল আর ফিরল না।

তারপর দিন যায়।

ছানি এক রাতে দেখে দেবী ঠাকুর হাজির।

ছানি বলল, আমি জানতাম তুমি আসবে!

দেবী ঠাকুর বলল, এখান থেকে চলে যেতে হবে।

কেন?

সবই গোপনে! রাতের গভীরে ঢোকা। ধানি ভেবেছিল, বাবা ফিরে এসেছে, দরজা খুলে দেখে বাবা না, দেবীদা।

ধানি প্রায় চাপা আর্তনাদ করে উঠেছিল, দিদি, দেবীদা!

ছানির পুষ্ট শরীর দুর্ভাবনা দুশ্চিন্তায় কিছুটা রোগা হয়ে গেছে। তবু স্তন বেশ পুষ্টই আছে। এবং দেখামাত্র লোভ এবং সংক্রামক ব্যাধির মতো শরীর অবশ হতে থাকলে দেবী ঠাকুর শিয়রে বসে পড়ল।

ধানি বলল, বাবা তোমায় খুঁজতে গেছে। মাস হয়ে গেল ফিরে আসছে না। বলে ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলল।

ছানি পাশ ফিরে শুয়ে আছে। ঘরে লণ্ঠন জ্বালা। কথা বলছে না।

ধানি বলল, এই দেবীদা দিদি না কেমন হয়ে গেছে।

কারো সঙ্গে রা করে না।

দেবীর চারপাশে সতর্ক নজর। এদিক ওদিক তাকিয়ে বলল, তোরা যা। আমি দেখছি কথা কয় কি না।

ধানি মানি ঘর থেকে বের হয়ে গেল। বেশি রাতে পাশের বাড়ির পিসি এসে শোয়। আজ বারণ করে দিতে হয়। দাদা এসেছে। তোমার শুতে হবে না পিসি।

ঘর থেকে দু-বোন বের হয়ে গেলেই ছানি বলেছিল, তুমি আসবে জানতাম।

সেই জানাজানি দুজনে রাতে ফের এক প্রস্থ ভালো করে হয়ে গেল। শরীরে গরম ধরলে আর সব অচল পয়সা। গরম মরে গেলে ছানি বাপের জন্য সে রাতে চোখের জল ফেলল। বাবা আর ফিরবে না আমার এমন বলে ভ্যাক করে ধানির মতো কিছুক্ষণ কেঁদেও নিল। দেবী ঠাকুর বুঝল প্রবোধ দিল। রাত থাকতে বের হয়ে পড়তে হবে। কাকপক্ষী টের যেন না পায়।

পরদিন সকালে দুই বোন উঠে দেখল, ঘর ফাঁকা। দরজায় শেকল তোলা।

বাপ গেল, দিদিও গেল।

শকুন উড়ছে।

শকুনের চোখ বড়ো তীক্ষ্ণ। সে শুধু উপরে উড়ে—গন্ধ শুঁকে বেড়ায়।

দুই বোন গলা জড়াজড়ি করে কাঁদল। প্রতিবেশীরা বলল, তোর দাদাকে খবর দে।

দাদা আর আসবে না।

তা না আসতেই পারে। ছোঁড়ারই বা কী দোষ। বোনের এত বড়ো কলঙ্ক মাথায় বয়ে বেড়াচ্ছে। বাপ নিখোঁজ। বোনটাও।

কোথায় গেল।

দু-বোন বলল, জানি না।

তবে জানে না বললে মিছে কথা বলা হবে।

নলহাটির ডাকবাংলোয় দেবী ঠাকুর কাজ পেয়েছে। চাপরাশির কাজ। দিদিকে নিয়ে সেখানেই তবে তুলেছে। কেবল রাতে বলেছিল, আমি যে নলহাটিতে আছি বলিস না।

দেবী ঠাকুরের বাবার মুদি দোকান বাজারে। পুত্রের প্রতি কোনোদিনই আবেগ বোধ করেনি। নষ্ট মেয়েছেলে তিনটের পেছনে দু-হাতে টাকা উড়িয়েছে। দোকান ফেল মারতে বসেছিল-সময়মতো রশি টেনে ধরেছে বলে রক্ষা। সেই থেকে দেবী ঠাকুর পলাতক।

বাড়ি জমিজমা চাষ আবাদ হাঁস কবুতর দুই বোন সামলায়। দুটো পেট। ধানি শাড়ি পরে। মানি ফ্রক। গাছপালার মতো শরীরে ডালপালা মেলছে। মুখে লাবণ্য, শাড়ি পরলে সুন্দরী ধানি, আলতা পরে মেলায় যায়। মানি ঘর ঝাঁট দেয়—দুধ দুইয়ে দিয়ে যায়

নরহরি, আবাদ দেখে সুখো মিঞা-পুরুষ মানুষ এ-কামে সে কামে বাড়িতে আসেই। নরহরি দুধ দুইয়ে নড়তে চায় না।—এক কাপ চা হবে নি ধানি?

হবে না! বস না। কী কাজকর্ম ফেলে এয়েছ?

আর বলিস না, বসার কী সময় আছে, টেনে এক কোরোশ রাস্তা যেতে হবে।

নরহরি একা মানুষ বিধবা পিসি নিয়ে সংসার। আচার্য বামুন। কাকচরিত্র জানে। গলায় তুলসির মালা। দুধ দুয়ে ফের বসে, এক গেলাস দুধ পায়। বাকি দুধ রোজ। দু-বোনের কপালে দুধ বড়ো জোটে না।

নরহরিই বলেছিল, মাখনদা গেছে নৈঋত কোণে। বুঝলে অগস্ত্য যাত্রা। ওই যাত্রায় বের হলে ফেরা যায় না।

মানি ফ্রক গুটিয়ে বসলে মাখনের মতো সাদা উরু দেখা যায়। বসেও। এই একটা লোভ আছে—তা বয়স একটু বেশি তার। ধানি শাড়ি পরে আলতা পায়ে দিলে দেবী জগদ্ধাত্রী। সে শুধু তাকিয়ে থাকে তখন। বলে তোমার বাবা বুঝলে ধানি একজন পুণ্যবান মানুষ। তা তিনি এখন সাধু সন্নেসী হয়ে গেছেন।

তুমি দেখতে পাও। ধানি ভাবল, কাকচরিত জানে, বলতেই পারে।

চোখ বুঝলে, কে কোথায় আছে টের পাই।

আমার দিদি কী করছে।

ও একখান বারান্দা বুঝলে লম্বা। সামনে মাঠ। চারপাশে গাছপালা। ফুলের গাছ। সূর্যমুখী, গেঁদা, দোপাটি, বেলফুল। নানা গাছ। তোমার দিদির বাচ্চাটা বসে আছে। দিদি তোমার বোতলে দুধ খাওয়াচ্ছে।

কোথায় আছে বলতে পার? কোনদিকে?

এই তোমার উত্তর-পশ্চিম কোণে। কী ঠিক না?

কী ঠিক না কথায় সায় দিতে পারে না মানি। দেবীদা নলহাটির কোথায় কোন ডাকবাংলোর চাপরাশি এটুকু শুধু জানে। নলহাটি কতদূর জানে না। কোনদিকে জানে না।

কী করে যেতে হয় জানে না। খবর নেবে কাকে দিয়ে—এমনও মনে হয়। সংসারে দিদিটার কথা উঠলে নিজেরাও ছোটো হয়ে যায়। শুধু গুম মেরে থাকা। বাবার জন্য ধানি

মানি আর অপেক্ষায় থাকে না। সুখো মিঞার এককথা, বড়া ভাইর মাথায় আল্লার গজব নেমে এয়েছে। পথের টানে বের হয়ে গেল।

তারা এই পথের টানটা কী জানে না। থানা পুলিশে খবর দেবার লোক নেই। শুধু কেউ পথে ঘাটে দেখা হলে এক প্রশ্ন, কী রে দিদি ফিরল? তোর বাবা।

ধানির আজকাল মনে হয়, এ-সব বলে শুধু লোক তামাসা দেখছে। নরহরিদাকে ধানি না পেরে একদিন বলল, মুখে পোকা পড়বে।

কার মুখে। কী হল?

আবার কার। আমরা নষ্ট মেয়ে বলে।

তা বলবে। গার্জিয়ান না থাকলে বলে। এত করে বললাম, পিসিরে নিয়ে এসে তুলি, আমি থাকি, সুখো মিঞা বরগা করে, চাষ আবাদ করলে দেখবি কত ফলে। আমি একাই একশো। গার্জিয়ান না থাকলে শকুন ওড়ে।

কথাটা মন্দ মনে হয়নি ধানির।

শকুন উড়ছে। টাউনে ভালোবাসা ছবি চলছে। ধানি গেছিল শোভাদির সঙ্গে। শোভাদির বর ভালো মানুষ বুঝেই গেছিল। শোভাদিকে রিকশায় তুলে দিয়ে তার সঙ্গে হেঁটে ফিরেছিল। এক রিকশায় চারজন ধরবে না, শোভাদি তার জা। দুটো রিকশা একসঙ্গে—কত টাকা, ধানির কট কট করছিল—সে বলেছিল হেঁটেই মেরে দেব। তা সাঁজ লেগে যাবে, লাগুক। শোভাদির বর বলেছিল সে না হয় আমি যাচ্ছি সঙ্গে। রিকশায় ওরা চলে গেলে বর মানুষটি বলল, টাউনে এলে, চা খাবে না?

দেরী হয়ে যাবে। মানিটা একা।

আরে আবার কবে আসব।

লোভ তারও শরীরে আছে। কেমন যেন ঝিম ধরা জীবনে, একটু নেশা, রাত হয়ে গেছিল ফিরতে। রেলগুমটি পার হয়ে পঞ্চানন তলার রাস্তায় বলল, চল কারবালা দিয়ে সোজা মেরে দি তা রাস্তা সংক্ষেপ হয়, ঝোপজঙ্গল আছে, সেই ঝোপজঙ্গলে ঢুকতেই হাত ধরে টানাটানি। গার্জিয়ান নেই বলেই এত সাহস।

মাথার উপরে শকুন উড়ছে।

ধানি বলল, সেই ভালো। পিসিকে, এনে তোল। পাশের ঘরটায় থাকলে শকুন সব ভেগে যাবে।

ভেগে গেল ঠিক—তবে নরহরি ছেড়ে দেবার পাত্র না। জমিজমার লোভে এক রাতে ধানির হাত ধরে বলল, দেখলি তো। কী ফসল তোদের ঘরে তুলে দিয়েছি। নরহরিকে ঘাঁটাতে কে সাহস করে।

ধানি জানে, লোকটার কাগচরিত্র জানা। সে কী বুঝে ফেলেছে বছরখানেক যেতে না যেতেই টান ধরে গেছে। গলায় তুলসীর মালা শুধু বদল করে ক-জন বোষ্টম বোষ্টমীকে খাওয়ালেই কাজ সারা।

ধানির গলায় তুলসীয় মালা উঠে গেল।

মানি এখন একা শোয়। কী ছিল, কী হয়ে গেল। জমিজমা নতুন সেটেলমেন্টে নরহরি নিজের নামে করিয়ে নিল। যে মালিক সে নেই, ক্যাম্প অফিসে গিয়ে এদিক ওদিক পয়সা দিয়ে অধিকটা দিদির নামে, বাকিটা তার নামে লিখিয়ে বলল, আমি কারো বাড়াতে নজর দিই না। কারো পয়সা ছুঁই না। মাখন কুণ্ডুর নাতি ভোগ করবে জমি। বংশ রক্ষা না হোক, কন্যের পক্ষে বংশধর জমি ভোগ করবে। মাখন কাকার কত কষ্টের উপার্জন। একটা পয়সা হাত থেকে খসত না। দিন নেই রাত নেই খেটে খেটে মানুষটা কম রেখে যায়নি। তা শকুনে খাবে, হয় নরহরির যে কাগচরিত্র জানা, মানি সেটা বুঝেছিল, দিদি একটা পুত্রসন্তান প্রসব করতেই। লোকটার তেলের কাছে মানি কাৎ। সে

যেন ইচ্ছে করলে সত্যি বলতে পারে, তার বাপ আছে না মরে গেছে বলতে পারে। কুণ্ডু মশাইর নাতি হবে নরহরি আগেই গাওনা গেয়েছে।

মানি এক সকালে উঠে মুখ গোমড়া করে বসে আছে। বাজারে যাবে নরহরি। ছেলেটা তার কাঁধ থেকে নামছে না। সকাল বেলা, বেশ রোদ উঠেছে, শীতও জাঁকিয়ে পড়েছে। আর এ-সময় মানি গোমড়া মুখে বসে আছে দেখতেই বলল, আরে আমিতো আছি শকুন উড়ে দেখুক না।

মানি বলল, একটা কথা রাখবে নরহরিদা!

এই সক্কালে তোর আবার কী কথা।

না বলছিলাম, তোমার তো কাগচরিত্র জানা, বল না, বাবা এখন কোথায় আছে?

নরহরি ট্যারচা চোখে দেখল মানিকে। ডুরে শাড়ি পরে উঠোনের কোনায় রোদে পিঠ দিয়ে বসে আছে। সে যে বড়ো রসিকজন। এমন একটা গানের কলি গলায় ভেসে উঠল। বলল, বলব। তবে বসতে হবে। হুট করে সব বলা যায় না। রাতে জায়গা পবিত্র করে রাখবি–বসব।

এই পবিত্র করে রাখবি কথাটাতে মানির মনে শিহরণ খেলে গেল। সে পবিত্র করেই রেখেছিল।

সকালে ধানি বলল, রাতে টের পেলে?

মানি বলল, কী জানি? জানি না।

ধানি বলল, একা ঘরে উনি কাগচরিত্র নিয়ে বসেছিলেন। ছেলেটাকে বুকের দুধ খাওয়াতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম—আমার আর জাগা হল না। সকালে উঠে দেখি তুই নিজেই কখন উঠে ঘরদোর লেপতে শুরু করেছিস। কী বলল?

মানির এককথা, কী জানি! তোমার সোয়ামি বোষ্টম মানুষ, তারে আমি ঠিক বুঝি না! জিগাও না কী কয় দ্যাখ।

লোকটা সকালেই গোরু বাছুর নিয়ে মাঠে বের হয়ে গেছে। ফিরলে বলল, বাবার খবর পেলে। কালতো বসলে।

বাবার খবরে আর কাজ কী? মানি আর বাবার খবর জানতে চায় না। ধানি বলল, তাহলে বাবা আমার নেই? কাল পবিত্র জায়গায় বসে কী টের পেলে বল!

বললাম মানিকে, তোর বাবা পথের টানে পড়ে গেছে। ফিরছে না।

আর কী বললে?

বললাম, তোর বাবা সবার ঠিকানায় গেছে।

এখানে এসেছিল?

ঘুরে গেছে।

গাঁয়ে এসে বাড়ি না ঢুকে চলে গেল।

নরহরি হাসল। বসে আছে বারান্দায়। আসন পেতে। কোলে মাখন কুণ্ডর নাতি। বংশধর। কন্যের পক্ষের। বলল, নাতির মুখ দেখে গেছে।

বুবলার মুখ দেখে গেল?

হাঁ, হাঁ। দেখল। রাস্তায় নিয়ে গেছিল মানি কোলে করে। লোকটা বলল নলহাটির রাস্তা চেন।

নলহাটি?

আরে হ্যাঁ। ওই রাস্তার খোঁজে গিয়ে দেখল, সবাই যে যার মতো বেঁচে আছে। সে কে? এই ভাবটা উদয় হতেই বিবাগী। সবারেই এককথা কয়।

কী কথা!

রাস্তাটা কোনদিকে। নলহাটির রাস্তার খোঁজ আর পায়নি।

তবে যে বললে, সব দেখে গেল?

এখন মাথায় অন্য পোকা। কারা এরা?

বষ্টুম মানুষের কথায় রহস্য—ধানি পাশে বসে শুনছে।

এই ধর না, বড়ো পুত্র কাঁচরাপাড়ায় বাড়ি করে বৌ নিয়ে সুখেই আছে। ছানি বছর না ঘুরতেই পেটে আর একখান। বাপের কথা কে মনে রেখেছে বল। মানি এতদিন অবুঝ ছিল। বলে হাই তুলল একটা। জমিজমা পেলে, ফনী ধরের বেটা রাজি। সেটাই শুধালাম মানিকে। মানি রাজি।

কিন্তু বাবা গেল কোথায়? কী দেখলে পবিত্র জায়গায় বসে?

কেমন গম্ভীর গলা নরহরির। চুল কোঁকড়ানো চোখ জবাফুলের মতো লাল— রাত্রি জাগরণ গেছে হতেই পারে-কালো ধুমসো চেহারার মধ্যবয়সী মানুষ। কাগচরিত্র আর ঝোলা ছিল সম্বল। মানুষ ঠকিয়ে, করকোষ্ঠি বিচার করে পয়সা সেই পয়সা থেকে বৌ, জমি, বংশধর ওই পর্যন্ত সে বোঝে। শরীর তার এমন খেলাতেই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। তার জন্য জমিজমা, গাই বাছুর, হাঁস কবুতর ছানি ধানি মানি লাগে—আর রহস্য এক ঘরে উদয়, অন্যঘর ফাঁকা।—তোদের বাপের শেষে অন্য রহস্য। দেখল, সবাই ত ভালোই আছে। সে না থাকলে সংসার অচল এই বিশ্বাসটা গেল মরে। সে বাড়তি মানুষ। নলহাটির খোঁজে যেতে যেতে পথের টানে ঘাটে-অঘাটে কুখাদ্য খেয়ে মরে পড়ে থাকল বালির চরায়। শকুনে চোখ উপড়ে খেল। শেষে থানা পুলিশ, মর্গ—এই আর কী? মানুষের জীবন। জীবনের আর একখানা কাগচরিত্র। সব গরমে হয় বুঝলি না। গরম মরে গেলে কিছু থাকে না। তখন বালির চরায় মরা লাশ।

তারপর একেবারে চুপ নরহরি। চোখ বুজে আছে। আসন পিঁড়ি। সোজা, লম্বমান দেহ, যেন ইচ্ছে করলেই শরীর থেকে জ্যোতি বের করতে পারে। বহু দূর থেকে কথা বলার মতো সতর্ক বাণী–শকুন উড়ছে।

আবার সতর্ক বাণী, বুঝলি ধানি মানি, নলহাটি যাবার রাস্তা কেউ কেউ খুঁজে পায় কেউ পায় না। খুঁজতে গেলেই আউল বাউল হয়ে যেতে হয়। মরে যেতে হয়। শকুনে তার চোখ উপড়ে খায়।